সুসাহিত্যিক

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত।
[*Vide Notification No. Syl/71/54, Dated 15. 12. 54.*]

সুসাহিত্যিকা

দ্বিতীয় ভাগ

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

মৈশানী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ; বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতির আজীবন সভ্য ; 'যুগান্তর', 'মাতৃমন্দির', 'গল্পগুচ্ছ' 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী সম্পাদক ; নিখিলবঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ-পদকপ্রাপ্ত এবং বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা

অসিত মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যরত্ন, সরস্বতী

প্রণীত

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মূল্য—চৌদ্দ আনা মাত্র।

বর্দ্ধিত মূল্য ১৷০

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২৩।২, বনমালী চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—২

প্রথম সংস্করণ
১৯৫৪

মুদ্রাকর :—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
'নবীন প্রেস'
৬, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

3977

সূচীপত্র

(গদ্যাংশ)

পদ্যাংশ

সুসাহিত্যিকা
দ্বিতীয় ভাগ

বাল্মীকির কবিত্বলাভ
স্বামী বিবেকানন্দ



স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রধান শিষ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ভারতীয় বেদান্তধর্ম্মের প্রচারক-হিসাবে ইনি পৃথিবী-বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার লিখিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্ত্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। ইনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

অতি প্রাচীনকালে একস্থানে জনৈক যুবক বাস করিত। সে কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না। তাহার শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। আত্মীয়বর্গের ভরণ-পোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন

করিল। পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং ঐ দস্যু-বৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদির ভরণপোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন যায়—দৈবক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। দস্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবর্ষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জান না, দস্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কিজন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ?" দস্যু উত্তরে বলিল,—"আমি এই দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি।" দেবর্ষি বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তুমি যাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ, তাহারা তোমার এই পাপের ভাগ লইবে?" দস্যু বলিল,—"নিশ্চয়ই,—তাহারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে।" তখন দেবর্ষি বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও—তাহা হইলে আমি আর পলাইতে পারিব না। তারপর তুমি বাড়ী গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস দেখি, তাহারা তোমার পাপের ভাগ-গ্রহণে প্রস্তুত কিনা।" দস্যু দেবর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পঁহুছিয়াই সে প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পিতঃ, আমি কিরূপে আপনাদের ভরণপোষণ করি, তাহা

কি আপনি জানেন?" পিতা উত্তর দিল,—"না, আমি জানি না।" তখন পুত্র বলিল,—"আমি দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করি।" পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি? তুই এইরূপে ঘোরতর পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস্—এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ—তোকে আজ হইতে আমি ত্যাজ্যপুত্র করিলাম।" তখন দস্যু মাতার সমীপে গিয়া তাহাকেও পিতার ন্যায় প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, তৎসম্বন্ধে মাতাও পিতার ন্যায় নিজ অজ্ঞতা জানাইলে দস্যু তাহাকে নিজের দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিল। মাতা ঐ কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল,—"উঃ, কি ভয়ানক কথা।" দস্যু তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"শুন মা, স্থির হও। ভয়ানকই হউক, আর যাহাই হউক—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে—তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে?"—মাতা তখন যেন দশ হাত পিছাইয়া অম্লানবদনে বলিল—"কেন, আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন? আমি ত কখনও দস্যুবৃত্তি করি নাই।" তখন দস্যু তাহার পত্নীর নিকট গমন করিয়া তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। পত্নী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিল,—"কখনই নহে। তুমি আমার

ভর্ত্তা—তুমি যেরূপেই আমার ভরণপোষণ কর'না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব ?"

দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিল,—"এই ত সংসারের নিয়ম ! যাহাদের জন্য আমি দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা পর্য্যন্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না।" এই ভাবিতে ভাবিতে সে দেবর্ষির নিকট উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে তাঁহার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বাড়ীর কথা আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। পরে সে কাতরভাবে তাঁহার নিকট বলিল,—"প্রভো, আমাকে উদ্ধার করুন—আমি কি করিব বলিয়া দিন।" তখন দেবর্ষি তাহাকে বলিল,—"বৎস, তুমি ত দেখিলে, পরিবার-বর্গের মধ্যে কেহই তোমাকে যথার্থ ভালবাসে না—অতএব ঐ সকল পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন ? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য্য থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে—আর যেদিন তুমি কপর্দ্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ-কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। অতএব তুমি তাঁহারই উপাসনা কর, একমাত্র যিনি সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, সকল অবস্থায়ই আমাদিগের সঙ্গে থাকেন। তিনি কখনই আমাদিগকে, পরিত্যাগ করেন না, কারণ যথার্থ ভালবাসায় বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুক।"

এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি তাহাকে সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। দস্যু তখন এক গভীর অরণ্যে গিয়া দিবারাত্র সাধন-ভজন ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান করিতে করিতে তাহার দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহ বল্মীকস্তূপে সংলগ্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে দস্যু শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—"মহর্ষে! উঠ।" দস্যু চমকিত হইয়া বলিল,—"মহর্ষি কে? আমি ত দস্যুমাত্র।" সেই বাণী আবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিল,—"তুমি এখন আর দস্যু নহ। তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে—তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। এখন তুমি 'বাল্মীকি' নামে প্রসিদ্ধ হইবে—যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলে যে, তোমার দেহের চতুষ্পার্শ্বে যে বল্মীকস্তূপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তুমি লক্ষ্য কর নাই।" এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।

মহর্ষি বাল্মীকি কিরূপে কবিত্বলাভ করিলেন, এক্ষণে সেই কথাই বলিতেছি। একদিন মহর্ষি পবিত্র ভাগীরথী-সলিলে অবগাহনার্থ যাইতেছিলেন, দেখিলেন, এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহর্ষি ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই এই আনন্দ-দৃশ্য শোকদৃশ্যে

পরিণত হইল। কোথা হইতে একটা তীর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। পুং-ক্রৌঞ্চটি সেই তীরবিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবধূ পরম দুঃখিতান্তঃকরণে পতির মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহর্ষির অন্তর এই শোক-দৃশ্য দর্শনে করুণার্দ্র হইল—তিনি, এই নিষ্ঠুর কর্ম্মের কর্ত্তা কে, জানিবার জন্য ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে এই শ্লোক নির্গত হইল ঃ—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

তিনি বলিলেন,—"রে ব্যাধ! তুই কি পাষণ্ড! তোর এক বিন্দুও দয়া-মায়া নাই ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও হত্যাকার্য্যে বিরত নহে।"

শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই মহর্ষির মনে উদয় হইল,—"একি? এ আমি কি বলিতেছি! আমি ত কখনও এমনভাবে কিছু বলি নাই।" তখন তিনি এক বাণী শুনিতে পাইলেন—"বৎস,—তোমার মুখ হইতে যাহা বাহির হইল, ইহার নাম কবিতা। তুমি জগতের হিতের জন্য কবিতায় রামের চরিত বর্ণনা কর।" এইরূপে প্রথম কবিতার সৃষ্টি হইল। প্রথম কবি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক করুণাবশে স্বতঃ-নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরম মনোহর কাব্য রামায়ণ রচনা করিলেন।

সমুদ্রে ঝড়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উপন্যাস রচনায় অত্যল্পকালের মধ্যে ইঁহার ন্যায় জনপ্রিয়তা আর কোন সাহিত্যিক কোনকালে অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। 'বিন্দুর ছেলে,' 'পল্লীসমাজ,' 'শ্রীকান্ত,' 'দেবদাস,' 'নিষ্কৃতি,' 'চরিত্রহীন,' 'গৃহদাহ,' 'পথের দাবী,' 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি ইঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। ইনি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিক্-চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলা-ফেরার মধ্যেও যেন একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ-গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?"

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল,—"কোর্ত্তা, নীচে যাও, কাপ্তান কইছে ছাইক্লোন হোতি পারে।"

মিনিট পনের পরেই দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। তুই-চারি-জন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্ত্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে—এইরূপ বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন, ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা' অদৃষ্টে যা' ঘটে, তা' ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায় তো অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া

মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপর নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, একসময়ে টুপ্ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়ীতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষ-কোটী হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাঁহাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস ও বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়া কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রীজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ত্তে গিয়া পাছে ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্ত্যনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একাধারে অনেক-গুলি ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কয়টিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই 'ছাইক্লোন' ; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থি-মজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথায় উধাও হইয়া চলিয়াছে ; পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই, এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকু'মার বুকের ভিতর ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র এক ডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাত শ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোম্‌রা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এ-ও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে ; তবে রাক্ষসী সাত শ' নয়, শতকোটি ; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা তো ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মেয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম। অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্ বজ্ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম ভাঙ্গিল, তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম,—"ভগবান্! এই চোখ দু'টি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহা সার্থক করিলে! এতদিন ধরিয়া তো সংসারের সর্ব্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এ সৃষ্টির তুলনা তো কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্ত্যনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!"

মনে মনে বলিলাম,—"হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে

আমাদের যাহা হইবে, সে তো আমি জানিই ; কিন্তু এখনও তো তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।"

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না ; কারণ, তা' হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় গতি-শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানাপ্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথায় উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর, কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয় তো তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল ; এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীদল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

জাম্বেসী নদীর উৎস-সন্ধানে

(ডাঃ লিভিংষ্টোন)

শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ লিভিংষ্টোন স্কট্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এক খৃষ্টান মিশনারি সমিতির চিকিৎসক হইয়া জনসেবা ও ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া যান। মাত্র তিন-চারি মাস চিকিৎসা ও ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য করিয়া তিনি আবিষ্কারের কার্য্যেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে লিভিংষ্টোন কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কালাহারি মরুভূমি অতিক্রম করিবার জন্য কেপটাউন হইতে যাত্রা করেন। কালাহারি মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি কিছুদিন পরে নগামী নামক একটি হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি অতিক্রমকালে একে-একে তিনবার তাঁহাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। লিভিংষ্টোনের পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় পর্য্যটক কালাহারি পার হইতে পারেন নাই। কিছুদিন নগামী হ্রদের তীরে বাস করিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি সদলবলে পুনরায় কেপটাউনে ফিরিয়া আসেন।

ইহার এক বৎসর পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে জাম্বেসী নদীর উৎস আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে লিভিংষ্টোন কেপটাউন

হইতে পুনরায় যাত্রা করেন। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি কালাহারি মরুভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হন। কালাহারি পৌঁছিবার পথে বুয়রদের সঙ্গে তাঁহাকে চারিটি খণ্ডযুদ্ধ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে চারিবারেই তিনি বুয়রদিগকে হটাইয়া দিতে সক্ষম হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি লোয়াণ্ডা নগরে পৌঁছেন। লোয়াণ্ডা আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূলস্থিত একটি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্ব্বর ; এখানে তিনি প্রায় ছয় হাত লম্বা একটি তামাকের গাছ দেখিয়াছিলেন। লোয়াণ্ডার পথে একদিন তিনি জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন। একটি ভীষণ সিংহ হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁহার নিগ্রো-ভৃত্য সুসী সিংহটিকে হত্যা করিয়া প্রভুর জীবনরক্ষা করিল।

পর বৎসর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে জাম্বেসী-নদীপথে যাইতে যাইতে ৫৬ মাইল দূর হইতে লিভিংষ্টোন দেখিতে পাইলেন যে, একটি বাষ্পস্তম্ভ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে এবং সেখানে মেঘ-গর্জ্জনের মত অনবরত এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। সে দেশের অসভ্য অধিবাসীরা তাঁহাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া জানাইয়া দিল যে, আর একটু অগ্রসর হইলেই ঐ দৈত্যের হাতে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইবে। তাঁহার অনুগত ভৃত্য সুসী প্রভুর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“তোমাকে আমি আর এক পা-ও অগ্রসর

হইতে দিব না। দৈত্যের হাতে তোমার প্রাণ গেলে আমাদের কি উপায় হইবে?” লিভিংষ্টোন একটু হাসিয়া বলিলেন,—“সুসী, তুমি ভীত হইও না। আমি দৈত্য মারিবার মন্ত্র জানি।”

শেষ পর্য্যন্ত দৈত্যের নিকট পৌঁছিয়া লিভিংষ্টোন দেখিতে পাইলেন, তিনি যাহাকে বাষ্পস্তম্ভ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা বাষ্পস্তম্ভ নয়—প্রকাণ্ড একটি জলপ্রপাত। তিনি ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে এই জলপ্রপাতের নাম রাখিলেন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এই প্রপাতের মুখে জাম্বেসী নদীর পরিসর এক মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের জলরাশি চারিশত ফুট উচ্চ পর্ব্বত হইতে ভীষণ শব্দ করিয়া নিম্নে এক অপরিসর খাতের মধ্যে পড়ে।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কারের পর লিভিংষ্টোন লোয়াণ্ডা নদীর সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসের শেষভাগে তিনি লোয়াণ্ডা-নদীমুখে অবস্থিত কুইলমেন শহরে পৌঁছেন। কুইলমেন হইতেই ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

জাম্বেসী নদীর উৎস আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই লিভিংষ্টোন আফ্রিকা-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমবারের ভ্রমণে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তিনি তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আফ্রিকা-অভিমুখে যাত্রা করেন। আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি

প্রথমেই শিরোয়া ও নিয়াসা নামে দুইটি হ্রদের আবিষ্কার করেন। শিরোয়া ও নিয়াসা যে অঞ্চলে অবস্থিত, সে বড় আশ্চর্য্য দেশ। হস্তী-মাংস ও একপ্রকার পোকার দ্বারা প্রস্তুত পিঠাই হইল সে দেশের লোকদের প্রধান খাদ্য। মধ্যে মধ্যে হাতীর মাংস ও পোকার পিঠা খাওয়াইয়া লিভিংষ্টোন সে দেশের কতকগুলি নামজাদা সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিশেষ কারণে হঠাৎ তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লিভিংষ্টোন পুনরায় আফ্রিকা-অভিমুখে যাত্রা করেন। এইবারের অভিযানে তাঁহাকে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পারিবারিক দুরবস্থা, মানসিক দুশ্চিন্তা এবং দুরারোগ্য ব্যাধি—ইহার সবগুলি এক সঙ্গে আসিয়া তাঁহার গতিপথে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লিভিংষ্টোন দমিবার পাত্র ছিলেন না, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি একটু একটু করিয়া তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি বেঙ্গ-উইলো ও মোয়েরা হ্রদ আবিষ্কার করিলেন। ইহার পর তিনি ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের পারে উজিজিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানেই তাঁহার সহিত ষ্ট্যান্‌লির সাক্ষাৎকার হইল। অতঃপর তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তর-সীমা আবিষ্কার করেন। এইস্থানে ষ্ট্যান্‌লি ও লিভিংষ্টোন কিছুকাল একসঙ্গে বাস করেন। একদিন অপরাহ্ণে দুই বন্ধুতে মিলিয়া নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী আলোচনা করিতে

করিতে ষ্ট্যান্‌লি লিভিংষ্টোনকে বলিলেন,—"এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া আপনি আর এদেশে থাকিতে পারিবেন না,—আমার সঙ্গে আপনাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আপনার জীবন আমাদের জাতির সম্পদ্ বিশেষ। এই জাতীয় সম্পদ্‌কে আমি হেলায় নষ্ট হইতে দিতে পারি না।" লিভিংষ্টোন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র—এখনও জীবনের অনেক কার্য্য বাকী রহিয়াছে। আপনি দেশে ফিরিয়া যান; আমার অবসর মিলিবে না এবং দেশে ফিরিয়া যাওয়াও হইবে না।

অগত্যা ষ্ট্যান্‌লি একাকী ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লিভিংষ্টোন বেঙ্গউইলো হ্রদের নিকট উপস্থিত হন। ইলালা নামক এক পল্লীতে অবস্থানকালে তিনি দুরারোগ্য রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সুসী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিল। এই সময়ে লিভিংষ্টোনের এক পা পর্য্যন্ত নড়িবার শক্তি ছিল না। আবশ্যক হইলে সুসীর পিঠে চড়িয়া তিনি বাহিরে ঘুরিয়া আসিতেন।

৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে সুসী ও বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া লিভিংষ্টোন শয্যা গ্রহণ করিলেন। সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা হইল। পরদিন সকালবেলা দরজা খুলিয়া সুসী দেখিতে পাইল, তাহার প্রভু বিছানার উপর হাঁটু গাড়িয়া উপাসনায় রত আছেন; নিকটে গিয়া দেখা গেল, তাঁহার প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে।

অতঃপর সুসী তাহার প্রভুর মৃতদেহ গাছের ছালে জড়াইয়া কাঁধে করিয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুসীর পাঁচজন বন্ধু এই কার্য্যে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। বহুশত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া সুসী তাহার প্রভুর মৃতদেহ তাঁহার দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রভুভক্তির যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

লিভিংষ্টোন চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে; কিন্তু জগদ্বাসী তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই, কোনকালেই ভুলিতে পারিবে না। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত-পালিত হইয়াও এই অদ্ভুতকর্ম্মা বীরপুরুষ বিশ্বমানবের হিতার্থে স্বেচ্ছায় আরব-বেদুঈনের দুঃখময় জীবন বাছিয়া লইয়াছিলেন। যতদিন জগৎ থাকিবে, যতদিন জগতের ইতিহাস থাকিবে, ডাঃ লিভিংষ্টোনও ততদিন জীবিত থাকিবেন।

বঙ্গদেশ-ভ্রমণ

রাজনারায়ণ বসু



রাজনারায়ণ বসু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। ইনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা,' 'ব্রহ্মসাধন,' 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা', 'সেকাল আর একাল' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এক্ষণে বাঙ্গালীরা কত দেশ-দেশান্তরে যাইতেছে, সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার বিলাত যাইতেছে, কেহ কেহ আট-সমুদ্র চৌদ্দ-নদীর পার আমেরিকায় যাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে কেহ যদি লেণ্ডোর বা মসূরী পর্য্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে লোকে বীরপুরুষ জ্ঞান করিত। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ ততদূর গিয়াছিলেন। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন একদিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে, তাঁহার 'লোটাস' ষ্টীমারে

আরোহণ করিয়া পূজার ছুটি বঙ্গদেশ-ভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে। তাঁহার 'লোটাস' ষ্টীমারটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা নামের উপযুক্ত ছিল। সেটিকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত। বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করিত।

যেদিন আমরা বাষ্পীয়পোত আরোহণ করিব, সেদিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আমরা কয়জনে রামগোপাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন ব্যাগ নামক পদার্থ—যাহা এক্ষণে কাপড়, তরকারী, ফল, হুকা, তামাক প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভদ্রলোককে ভদ্র মুটিয়াতে পরিণত করে—তাহার ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রত্যেকে এক-একটি কাপড়ের মোট লইয়া ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌঁছিলাম।

পূর্ব্বে ত্রিবেণী, বলাগড়, শান্তিপুর প্রভৃতি কি স্বাস্থ্যকর স্থানই ছিল। লোকে কলিকাতা হইতে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় যাইত। এক্ষণে ঐ সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আকর হইয়াছে। বাঘাটি ত্রিবেণীর নিকটস্থ গ্রাম। আমরা তথায় রামগোপাল বাবুর বাটিতে পূজার কয়েকদিন যাপন করিলাম। ত্রিবেণীতে পুনরায় ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি আমোদে কাটানো হইত। সকাল-বিকাল দুইবেলা তীরে নামিয়া আমরা পাখী

মারিতে যাইতাম। একদিন রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে দিলেন।

আমি বলিলাম,—"আমি পিস্তল কখনও ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে, পাছে হাতটা উড়িয়া যায়।"

রামগোপাল বাবু বলিলেন,—"গেলই বা।"

তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

আমরা ক্রমে 'বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড' নবদ্বীপ পার হইয়া বিল্বগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ষ্টীমারে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় ষ্টীমার নঙ্গর করিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করিলাম।

মুর্শিদাবাদ হইতে ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলাভিমুখে ষ্টীমার চালানো হয়। তৎপরে উক্ত সঙ্গমস্থল হইতে আমারা রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পৌঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাবদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন।

রাজমহলের উল্লিখিত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা ষ্টীমারে আরোহণপূর্ব্বক, রাজমহলের পর্ব্বতের দিকে গঙ্গানদীর

যে খাড়ী গিয়াছে, সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূরে গমন করিয়া উক্ত পাহাড়গুলি পর্য্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বন্যগীত শ্রবণ ও বন্যনৃত্য দর্শন করি।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলোয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন-উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল।

যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন গ্রাম্য লোকেরা "ধোঁয়া কলের লা এয়েছে রে, ধোঁয়া কলের লা এয়েছে রে"—বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে বাষ্পীয়পোত কখনও মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত যে, গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। এ কি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বাস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন

আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি ও আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে।

ইহার মধ্যে একদিন মহানন্দার তীরে আমরা নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময় বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন আমরা ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি 'কড়-কড়ে পানিতে' (rapid) পড়িলাম। ষ্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপাল বাবুকে বলিলাম,—"আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যা'ক।"

রামগোপাল বাবু অসমসাহসিক কার্য্যসকল করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন,—"ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। তাহাতে বয়লার (boiler) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।"

ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পবারি পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় 'কড়-কড়ে' পার হইল। তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটি-কালেক্টর বাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম।

———

সেকেন্দার ও চন্দ্রগুপ্ত

(নাটকাকারে লিখিত)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল্. রায়) ১২৭০ সালে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বহু নাটক, প্রহসন ও কবিতা রচনা করিয়া ইনি বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'আর্য্যগরিমা', 'অবতার', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৩২০ সালে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন।

(স্থান—সিন্ধুনদ-তট ; দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী ; কাল—সন্ধ্যা।)

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝল্মল্ করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি! এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

সেলুকস্। সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বত সম মন্থর গমনে চলেছে, কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখায় প'ড়ে আছে, কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস্। কি সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"আমার কাছে তুমি কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?"—সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিল,—"রাজার প্রতি রাজার আচরণ!" চমকিত হ'লাম, ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস্। সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তাঁর সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই, এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস্। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন, সম্রাট্?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পুর্ণ কর্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই। কি আশ্চর্য্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে চ'লে এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহা শত্রুসৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এশিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর—আমি অর্দ্ধেক এশিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

(চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনাসের প্রবেশ)।

সেকেন্দার। কি সংবাদ আন্টিগোনাস্? এ কে?

আন্টিগোনাস্। গুপ্তচর।

সেলুকস্। সে কি?

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনাস্। আমি দেখলাম যে, এক শিবিরের পার্শ্বে ব'সে নির্জ্জনে শুষ্ক তালপত্রে এই যুবক কি লিখ্‌ছিল। আমি

দেখতে চাইলায়, পত্রখানি দেখাল ; পড়তে পারলাম না—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখছিলে যুবক ? সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব !—রাজাধিরাজ ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শিখে নাই।

(সেকেন্দার একবার সেলুকসের দিকে চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন)—"উত্তম। বল কি লিখছিলে।"

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী চালনা, ব্যূহ-রচনা প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এইসব মাসাবধিকাল ধ'রে শিখছিলাম। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল স্থান পরিত্যাগ ক'রে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি, তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায় ?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার শাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে ?—

তবে শুনুন সম্রাট্। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার ক'রে আমায় নির্ব্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর ?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুন্‌লাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্ত্তা। অর্দ্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে নদ-নদী গিরি দুর্ব্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুন্‌লাম তিনি ভারতবর্ষে

এসে আর্য্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্! আমার ইচ্ছা হ'ল দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রুকুটি দেখে, সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্য্যের মহাবীর্য্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কর্‌ছিলাম। আমার ইচ্ছা, শুদ্ধ আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা—এই মাত্র।

সেকেন্দার। বালক, তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ ক'রেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার শাহ্ বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্র-হিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার শাহ্ এত কাপুরুষ, তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস্, বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্! আমার বধ না ক'রে বন্দী কর্ত্তে পার্‌বেন না। (তরবারি বাহির করিলেন)।

সেকেন্দার। (সোল্লাসে) চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী করব না। আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। যাও বীর! মুক্ত তুমি। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও।

———

কৃষি ও কৃষকের কথা

চিত্তরঞ্জন দাশ



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার তেলীরবাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইনি সুসাহিত্যিক ও সুকবি। ইঁহার রচিত 'সাগর-সঙ্গীত' বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীর কথা মনে আসে, তারপরই দেশের দারিদ্র্যের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। আবার কৃষকের কথা ও দারিদ্র্যের কথা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। আমরা সকলেই জানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্য্যই আমাদের প্রধান উপজীবিকা। আবার ইহাও আমরা জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতের আর কোথাও নাই। কিন্তু এই ঘোর দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বোধ হয়, ভাল করিয়া জনি না এবং সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না।

আমরা ত একেবারে এক মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছি; তাই এই অতি সত্য যথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীয়েরা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাংলাদেশে ত সোনা-রূপার খনি নাই। তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতাম।

আমাদের সমস্ত কর্ষণযোগ্য ভূমির হিসাব করিলে জনপ্রতি গড়পড়তা দুই বিঘারও কিছু কম দাঁড়ায়। এই দুই বিঘা জমি চাষ করিয়া একজনের জীবনযাত্রার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। তারপরে অনাবৃষ্টি আছে, দুর্ব্বৎসরও আছে। আমাদের চাষীরা রোগ-ক্লিষ্ট ও স্বাস্থ্যহীন বলিয়া এই দুই বিঘা জমিও তাহারা বারোমাস পরিশ্রম করিয়া ভাল করিয়া কাজে লাগাইতে পারে না।

আমাদের সমস্ত বাংলাদেশে বৎসরে বত্রিশ কোটী কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্যশস্যের আবশ্যক। কিন্তু আমাদের শস্য উৎপন্ন হয় মোটে চব্বিশ কোটী আশী লক্ষ মণ। তাহা হইতে প্রায় এক কোটী মণ প্রত্যেক বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যেখানে বত্রিশ কোটী কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্যশস্য আবশ্যক, সেখানে থাকে মাত্র তেইশ কোটী আশী লক্ষ মণ।

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে যদি সাত মণ করিয়া খাদ্যশস্য যথার্থ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এক কোটী কুড়ি লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা নাই।

আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের আর একটি প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে এমন গ্রাম নাই, যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা নব্বই জন লোক ঋণগ্রস্ত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যের উৎপন্ন শস্য হইতে চাষীরা ত জীবনধারণ করিতেই পারে না, এমন কি, যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহারও একটা অংশ মহাজনের ঘরে গিয়া পড়ে।

মানুষ ভাল করিয়া জীবনধারণ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য, মনকে শান্ত ও প্রসন্ন রাখিবার জন্য এবং অনাবৃষ্টি ও দুর্ব্বৎসরের বিপদ্ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যে অর্থ আবশ্যক, সেই পরিমাণ অর্থাগমের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। আমাদের চাষীদের অবস্থা ভাল করিয়া ভাবিতে গেলে এই ঘোর দরিদ্রতানিবন্ধন দুইদিক দিয়া আমাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে। একদিকে অর্থাভাবে আমাদের যে মনুষ্যত্বের আদর্শ, তাহা লাভ করিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন শক্তিহীন, মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছি আবার অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের মধ্যে সেই একই কারণে চুরি, ডাকাতি ও

অন্যান্য অনেক প্রকার দুষ্কার্য্য বাড়িতেছে। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইবে।

আমাদের গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। পল্লীসমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রস্থল। সেই কেন্দ্রস্থল ব্যাধিদুষ্ট হওয়ায় যদি তাহার সঞ্জীবনী-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। একদিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর একদিকে বড় বড় শহরে বিলাসী ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ ও মোহ। কাজেই বড় বড় শহরগুলা এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদিগকে টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে। সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা।

স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষীদিগকে এই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, এবং চাষীরা যাহাতে আয় বৃদ্ধি করিয়া স্বচ্ছন্দে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

অর্থ-সঞ্চয়

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্কুল ইন্সপেক্টর পদ হইতে জনশিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে 'আচার প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' নামক তিনখানি পুস্তক হিন্দু জাতির জীবন-বেদ স্বরূপ। ইনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

আমাদের দেশ বড়ই দরিদ্র। ইহা যে কত দরিদ্র, তাহা অনেকেই মনোমধ্যে ধারণা করিতে পারেন না। সমাজের অবনতির চিহ্ন অনেকগুলিই এবং সকলগুলিই দারিদ্র্যের সূচক; অতএব এক দারিদ্র্যকেই সর্ব্বপ্রকার অবনতির লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়।

পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৮৮০ অব্দে ব্রিটেনদ্বীপে প্রতি ব্যক্তির গড়ে বার্ষিক আয় ৩৩০৲ টাকা, ফ্রান্সে ১০০৲ টাকা, পর্ত্তুগালে ৮০৲ টাকা, তুরস্কে ৪০৲ টাকা, এবং ভারতবর্ষে ২৭৲ টাকা বই নয়। ঐ সকল দেশের মধ্যে কোনটির সম্বন্ধেই এমন কথা কেহ বলেন না যে, সেখানকার

লোকেরা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এখানকার পাঁচ কোটি লোক অর্থাৎ সমস্ত জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে।

অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের মঙ্গলকর নহে ; যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থধর্ম্মের অনুকূল আচরণ নহে। দানধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায়, তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায় ; আত্মসংযম, ভবিষ্যদ্দর্শন, উপায়োদ্ভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা আসিয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ ঘটে। কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী, অবিলাসী এবং বাঙ্‌নিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে খর্‌চে লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে। যে সমাজে শক্তি-সঞ্চারের প্রয়োজন, তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল, খর্‌চে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল নয়। এতদ্দেশীয় যতগুলি সমাজের কথা আমি জানি, তাহার মধ্যে মাড়বারী, জৈনদিগের প্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহারা সচরাচর অতি দীন-দরিদ্রের ভাবেই থাকে— উহাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। উহাদিগের মধ্যে মোটা কাপড় পরিতে, জলে ভিজিতে, পায়ে চলিতে ক্রোড়পতিরও অপমান নাই। উহারা যে ব্যবসায়ে হাত দেয়, তাহাতেই সফলতা লাভ করে। উহারা সহজে কেহ কিছু চাহিলে দেয় না। কিন্তু এমন মাড়বারী বণিক্ নাই

বলিলেই হয়, যাহার সহায়তায় আর দুই-তিনটি মাড়বারী নিরন্ন দশা হইতে উত্থিত হইয়া স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইয়াছে। ইহারা দানধর্ম্ম ও সঞ্চয়শীলতা দুইটিকে মিলাইতে পারে; ইহাদের ঘরে লক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে থাকেন। তবে আজিকালি দেখিতে পাইবে, উহাদের মধ্যেও সংসর্গদোষ সংক্রামিত হইয়া কোন কোন মাড়বারী বণিকের পুত্র বিলাসী, অমিতাচারী এবং লক্ষ্মী-ছাড়া হইতেছে।

গৃহস্থকে যে কিছু সঞ্চয় করিতে হয়, একথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক বেকন বলিয়াছেন,—"যত আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিবে।"

আমি স্বদেশীয়দিগকে বলি, তোমাদের শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তোমরা সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ভবিষ্যৎ কালের জন্য আয়ের সিকি রাখিবে, অর্দ্ধেকে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ করিবে, আর এক আনা ধার দিয়া সুদে বাড়াইবে।" ভগবান মনু বলিয়াছেন,—"তিন বৎসরের খরচের যোগ্য অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিন দিনের যোগ্য, অন্ততঃ একদিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে।" বাস্তবিক সকলের পক্ষে সমপরিমাণ সঞ্চয় সম্ভব হয় না। এই জন্যই মনুসংহিতায় এরূপ কোন বাঁধা নিয়ম লিখিত হয় নাই। কেহ বা তিন বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিবে, কেহ বা একদিনের আহারের উপযুক্ত সঞ্চয় করিবে। আমিও তাহাই বলি;—সকলকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে; যে দিন আনে,

সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে, যে মাসে আনে, সে প্রসি মাসে সঞ্চয় করিবে, যে বর্ষে আনে, সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর একটি নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে, খরচের শেষভাগে নয়।

মনে কর, তুমি আজ দুই সের চাউল মজুরী পাইয়াছ, উহা হইতে কিছুই রাখিতে পার না, রান্না হইলে সব ভাত ফুরাইয়া যাইতে পারে। তবু এক মুঠা চাউল ঐ কলসীটাতে রাখিয়া দাও—বাকী চাউল রন্ধন করা হউক। আর তুমি মাসে দশটি টাকা পাও, খরচে কুলায় না; তবু দুই আনা পয়সা কোন মহাজনের কাছে গচ্ছিতরূপে কিংবা ব্যাঙ্কে রাখিয়া বাকি হইতে খরচ চালাও। এরূপে যে যাহা রাখিতে পারিবে, তাহা আগেই রাখিয়া দিবে।

আর একটি নিয়ম তাছে। যাহা সঞ্চিত হইল, পারতপক্ষে তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিও না। সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উহা কাহারও সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ, তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে—তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎপরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে। এই জন্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তির চক্ষে সম্মিলিত পরিবারের ব্যবস্থা অমিতব্যয়িতার প্রতিকূলরূপেই প্রতীতি হয়।

সঞ্চয়শীলতা এই দারিদ্র্য দোষের এবং তাহার আনুষঙ্গিক

অবনতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থলোকের পক্ষে নিম্নবর্ত্তী নিয়ম কয়েকটি যত্নপূর্ব্বক পালনীয় ঃ—

১। সকলকেই কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে।

২। সঞ্চয় করা খরচের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, খরচের পরে নহে।

৩। সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।

৪। যে দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

৫। যাহা ক্রয় করিবে, তাহা নগদ মূল্য দিয়া কিনিবে, ধারে কিনিবে না।

৬। আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।

———

সত্তর বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা

প্রফুল্লচন্দ্র রায়



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ও বিশ্ববরেণ্য রাসায়ণিক ছিলেন। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' এবং 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার'—এই দুইখানি ইঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ঠিক শ্রাবণ মাসে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। সে সময়ে কলিকাতা কিরূপ ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, উহা যেন নখ-দর্পণে দেখিতে পাইতেছি। বাস্তবিক তখন কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, তাহা শুনিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে, বিশেষতঃ যুবকবৃন্দের। আমার মত বৃদ্ধের নিকটে অবশ্য আমার কিছু বলিবার নাই।

প্রথম যখন আমি কলিকাতায় আসিলাম, তখন আমাদের বাসা ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সন্নিকটে। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। তখন সবেমাত্র খিলান-করা পয়ঃপ্রণালী কলিকাতায় প্রবর্ত্তিত

হইতেছে এবং নূতন জলের কল আসিয়াছে। হিন্দুসমাজের অনেকে সেই কলের জল অপবিত্র বলিয়া ব্যবহার করিতে নারাজ ছিলেন। অধিকাংশ হিন্দু গৃহস্থের গৃহে উড়িয়া ভারী-দিগের দ্বারা ভারে-তোলা গঙ্গাজল ব্যবহৃত হইত। এক ভার অর্থাৎ দুই কলস জলের মূল্য দুই আনা ছিল। হেদুয়া, গোলদীঘি, লালদীঘি প্রভৃতি হইতেও ভারীর দ্বারা জল আনাইয়া পানীয়রূপে ব্যবহার করা হইত। তখন প্রতি বাড়ীতে মাটির সাধারণ পাতকূয়া ছিল, তাহার জলে থালা, বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। পথে একশ্রেণীর লোক "কূয়োর ঘটি তোলাবে" বলিয়া হাঁকিত। তাহাদের নিকট দড়ি ও কাঁটা থাকিত।

পথের দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী বা পগার ছিল। সেই পগার দিয়া অতি কদর্য্য পঙ্কিল জলের স্রোত বহিত, তাহার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইত। আর সেই পগারের পাড়ে গৃহস্থবাড়ী ও দোকান ছিল। প্রত্যেক পগার পার হইবার জন্য সাঁকো ছিল। অনেক এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, গাড়ী-ঘোড়া একেবারে তাহার ভিতর গিয়া পড়িয়াছে। ঐ সব পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইত। পায়খানার মলও তাহাতে ঢালা হইত। আমার সম্পর্কীয় জ্যাঠামহাশয় প্রভৃতি যাঁহারা তখন কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, তাঁহারা বলিতেন,—হাটখোলা, কুমারটুলি প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মেথর গঙ্গায় বিষ্ঠা

ঢালিত, স্রোতে সে সমস্ত ভাসিয়া বেড়াইত। কাপড় কাচিবার সময় তাহাতে সেই মল লাগিয়া যাইত, আর স্নানের সময় সীমন্তিনীদের কেশগুচ্ছে তাহা জড়িত হইয়া উঠিত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। তখনকার তুলনায় এখনকার কলিকাতা স্বর্গ।

আমরা হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলাম। তখন হেয়ার স্কুল বসিত ভবানীচরণ দত্ত লেনের একটি একতলা বাড়ীতে। এখন যেখানে সংস্কৃত কলেজ, উহার অপর পার্শ্বে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। তখন হেয়ার স্কুলে মাত্র ২৪ খানি ঘর ছিল। উহার যে জায়গা খালি ছিল, সেখানে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন।

তখন বর্ত্তমান হাইকোর্টের বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। যাদুঘর তখন নির্ম্মিত হইতেছিল। পার্ক ষ্ট্রীটে এসিয়াটিক্ সোসাইটির হলে যাদুঘর অবস্থিত ছিল। এখনও শকট চালকেরা উহাকে 'পুরানো যাদুঘর' বলে। চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে এক চিড়িয়াখানা ছিল, দলে দলে লোক তাহা দেখিতে যাইত। কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সি, জেনারেল এসেম্ব্লি ও লণ্ডন মিশনারির খুব নাম ছিল, কলিকাতায় ২।৪ টি মাত্র স্কুল ছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন এবং 'সুলভ সমাচার' নামক একখানি পত্রিকার প্রচলন করেন। তাহাতে অনেক সংবাদ থাকিত, কিন্তু দাম ছিল মোটে

এক পয়সা। ঐ রকম অল্প মূল্যের সংবাদপত্র পূর্ব্বে আর ছিল না।

দেখিতে দেখিতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। হাইকোর্ট নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলে পর পিতামহাশয় নিজের মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বিরের জন্য মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বিলাতী জজদিগকে দেখিয়া তখন অবাক্ হইয়া যাইতাম। আজ আমাদের দেশী লোকেরাও জজ হইতেছেন। পরলোকগত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়কেও আমি দেখিয়াছি।

কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার তখনও আরম্ভ হয় নাই। তখনকার চৌরঙ্গী ও এখনকার চৌরঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। একালের মত বিরাট হর্ম্ম্য তখন মাত্র দুই-চারিটির অধিক নির্ম্মিত হয় নাই। উইলসন্ হোটেল তখন অবশ্য ছিল, কিন্তু একালের মত এত প্রকাণ্ড ছিল না; তখন কলিকাতার ধন-দৌলত এখনকার এক-দশমাংশও ছিল কিনা সন্দেহ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তেমন ছিল না। পাট তখন এদেশে জন্মিত না বলিলেও চলে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের প্রয়োজনানুযায়ী পাট চাষ হইত। গো-বন্ধনের জন্য, ঘর বা বাগানাদির বেড়ার জন্য এবং মৃৎকুটীরের চাল ছাইবার জন্য রজ্জু প্রস্তুত করিতে পাটের আবশ্যক হইত। তখন প্রতি গৃহস্থ অবসর মত পাট হইতে সূতা পাকাইত। তখন পাট বড় একটা রপ্তানি হইত না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পাটের রপ্তানি হয়। তখন দুই-একটি মাত্র পাটের কারখানা হইতেছে। এখন কলিকাতা

বন্দর হইতে পাট ও বোম্বাই বন্দর হইতে তূলা রপ্তানি বাদ দিলে কি অবস্থা হয়, তাহা কল্পনায় আসে না।

হাবড়ার লোকসংখ্যার অধিকাংশই পাটের ব্যবসায়দার ও কুলী লইয়া গঠিত। বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলী নদীর উভয় তটে অন্যূন ৮০টি পাটের কল আছে। প্রত্যেক পাটের কলে গড়ে ৪।৫ হাজার শ্রমজীবী আছে। এইরূপে প্রায় তিন-চারি লক্ষ লোক আজ জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যখন পাট হয় নাই, তখন চাউলও কম হইত, চাউলের রপ্তানিও খুব কম ছিল। আমাদের ছেলে-বেলায় পাঁচ সিকা মণ চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। তাহার পর দেড় টাকা, পৌণে দুই টাকা। দেশী জিনিষের দুর্ম্মূল্যতা চাউলের দর দেখিয়া বুঝা যায়। আমি যখন কলিকাতায় আসি, তখন বিশুদ্ধ ঘৃত প্রতি মণ ১৮৲ আঠার টাকা, আর এখন বিশুদ্ধ ঘৃত তো বাজারে পাওয়াই যায় না। তখন ঘৃতে চর্ব্বি অথবা মহুয়া প্রভৃতির তৈল ভেজাল দেওয়া হইত না। মিঠাই, কচুরি, গজা, জিলিপি প্রভৃতি পাঁচ আনা সের মূল্যে পাওয়া যাইত।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিহার অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আমার পিতা এই জন্য তাড়াতাড়ি একগাড়ী অর্থাৎ কুড়িমণ বালাম চাউল এগার সিকা দরে ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, মহাজনেরা এই সংবাদ পাইতে না পাইতেই দর কিছু চড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, নচেৎ বাজারদর আড়াই টাকার বেশী হইত

না। এখন সেই চাউলের বাজারদর দশ টাকা। আমরা যে বাড়ীতে মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় থাকিতাম, তাহার ভাড়া এখন অন্যূন্ দেড়শত টাকা। তখনকার দিনে আজকালকার মত এত বেশী পয়সা, সিকি, দুয়ানির প্রাচুর্য্য ছিল না, সাধারণ কেনাবেচা কড়ি দিয়া চলিত। যাহার যতটুকু জিনিষ আবশ্যক, কড়ি-মূল্যে তাহা ক্রয় করিত। আজকাল সামান্য পানওয়ালীও এক পয়সার কমে পান বিক্রয় করে না।

বলা বাহুল্য, গঙ্গার সেতু তাহার অনেক পরে হইয়াছে—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তখনকার বড়বাজার আর এখনকার বড়-বাজারে অনেক প্রভেদ। তখন কতক কতক মাড়োয়ারী কলিকাতায় আসিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বটে। বিলাতী কাপড়ের আমদানি তাহারাই আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় দুই-চারিজন বাঙ্গালী বিদেশী সওদাগরী হৌসের মুচ্ছদ্দী ছিল। 'প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী' ও 'শিবকৃষ্ণ এণ্ড কোম্পানী' প্রভৃতি দুই-চারিটি বড় বড় বাঙ্গালী ফারম্ (Firm) ছিল, ইহারা বিলাতী মাল আমদানি করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের অপটুতা ও শ্রম-বিমুখতা-বশতঃ মাড়োয়ারীরা সেই সমস্ত পদ দখল করিয়া লইয়াছে। তখন চোর বাগানের মল্লিকদের ও জোড়াসাঁকোর শ্যাম মল্লিক প্রভৃতির লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল।

এক সময়ে বড়বাজারে বাঙ্গালীর অনেক বাস্তুভিটা ও জমি ছিল, এখন অবশ্য দেখিতে গেলে বর্দ্ধমানের ও কাশিম

বাজারের মহারাজাদের এক আনা আন্দাজ জায়গা আছে। একদিকে গঙ্গা হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত, আর অন্য দিকে কমারটুলীর কাছাকাছি বহু পল্লী মাড়োয়ারীদের দখলে আসিয়াছে। আর্ম্মেনিয়ান আছে, ইহুদী আছে, ইংরেজ আছে, ইহারা সমস্ত জমি বাঙ্গালীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছে। আর অভাগা বাঙ্গালী 'ভিটেমাটি-চ্যুত' হইয়া ক্রমে এই সংগ্রামে হটিয়া আসিতেছে। বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারত বন্ধু জন ব্রাইটের কথায় "আমরা আজ আপন বাসভূমিতে গৃহহীন প্রবাসী মাত্র।"

গঙ্গায় তখন ষ্টীমার একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। মাস্তুলওয়ালা, পাইল-তোলা জাহাজই ছিল বেশীর ভাগ। সুয়েজ ক্যানাল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাটা হয়। তখন হইতে সুয়েজের ভিতর দিয়া ষ্টীমার চলিতে থাকে। তাহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া পাইল-তোলা জাহাজকে এদেশে আসিতে হইত। তাহাতে প্রায় তিন-চারি মাস সময় লাগিত ; কাজেই পণ্যসম্ভার অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু সুয়েজ খাল কাটা হইবার পর তিন চারি সপ্তাহে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় আসা সম্ভব হইল ; ফলে পণ্য অতি সস্তায় বিক্রয় হইতে লাগিল।

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ইঁহার রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহাকে অনন্তকাল অমর করিয়া রাখিবে। ইনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

রাধারাণী নামে এক বালিকা মহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকর্দ্দমা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকর্দ্দমা; মোকর্দ্দমাটি বিধবা হাই-কোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাত ডিক্রী-জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিভি কৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল

না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহাও বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজেকাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি-আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া সকল লোক ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়,—পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মূষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার

অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘনকৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল,—"কে গা, তুমি কাঁদ?"

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণী ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,—"আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছেন।"

সে পুরুষ বলিল,—"তুমি কোথা গিয়েছিলে?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল,—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

রাধারাণী বলিল,—"শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল,—"আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা! এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বয়স কত?"

"দশ এগার বছর।"

"তোমার নাম কি?"

"রাধারাণী।"

"হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়েছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথের হাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই, —সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও তাহা বালিকার হৃদয়-মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল,—"আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন,

তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।”

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবেন না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল,—“ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।” সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল,—“এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেক্‌ছে।”

“ডবল পয়সা দেখিতেছ না, দুইটা বই দিই নাই।”

রাধা। তা, এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ কর্‌ছে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

“না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ কর্‌ছে।”

রাধা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল,—“তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।”

সঙ্গী বলিল,—"আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। আগে তুমি ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল,—'আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল। তাহা কাচিতে দিয়াছি।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে তাহাকে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্নমনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল,—সকাতরে বলিল,—"মা, এখন কি হবে?"

মা বলিল,—"কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিতেই পদ্মলোচন সাহা ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান।

পদ্মলোচন একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীর হাতে দিল। বলিল,—"রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল,—"ও মা! আমার কিসের কাপড়?"

পদ্মলোচন। "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়ে এস।

রাধারাণী তখন বলিল,—"ও মা,—সেই গো! সেই! তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল,—"তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি, তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

এদিকে রাধারাণী মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা দেখিয়া বলিলেন,—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল,—"তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন?"

মা বলিলেন,—"না, তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।" রাধারাণী বড় ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষর পরিচয় ছল সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে।

রাধারাণী বলিল,—"হাঁ মা, এমন লোক কে মা ?"

মা বলিলেন,—"তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এইজন্য তিনি নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"—(ঈষৎ পরিবর্ত্তিত)

স্বাধীন ভারত

অশোক গুহ



শ্রীঅশোক গুহ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বরিশাল জেলার কাঁচাবালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গলার উদীয়মান সাহিত্যিকদের অন্যতম। ইঁহার লিখিত 'গোর্কির-মা', 'লাও চাও-র 'রিক্সাওয়ালা' প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গলার অনুবাদ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

আনন্দের ঢেউ বহিতেছে। অন্ধকারের যুগ শেষ হইল, আমরা এবার আলোর তীরে উপনীত। এই আলোর তীরে দাঁড়াইয়া মনে পড়ে আঁধারের বুকে মরণ-পণ সংগ্রামের কথা। মন চলিয়া যায় অতীতে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

দীর্ঘ দুইশত বৎসরের প্রারম্ভে ফিরিয়া চলিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চম পাদে তখন ইতিহাস। পলাশীর আম্র কাননে সেদিন সূর্য্য ডুবিয়া গেল। বাঙ্গালী সেদিন কত অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু সূর্য্য বধির। বিদেশী বণিক্-লক্ষ্মীর পায়ে তাহার স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়া সে ডুবিল। অন্ধকারের যুগ সুরু হইল, আর তাহার গর্ভে বিদেশী সিংহাসন স্থাপিত হইল।

সে এক ভাঙনের যুগ। চারিদিকে তখন ভাঙন সুরু হইয়াছে। আর ইংরাজ তাহার কর্ত্তা। অর্থনৈতিক প্রাকার সে ভাঙিয়া ফেলিল, ভাঙিল দেশের তাঁত-শিল্প আর চরকা। সমাজ-ব্যবস্থা তছ্‌নচ্‌ হইয়া গেল। ইংরাজ দেশের ধন লুটিয়া নিজের ভাণ্ডার ভরাইল, তাহারই ফলে নিজের দেশে আসিল শিল্প-বিপ্লব। কিন্তু ভারত কি পাইল? নূতন কিছু ধ্বংসের উপর গড়িয়া তোলা তো ইংরাজের কাজ নয়। তাই ভারত ধ্বংসের স্তূপে গোঙাইতে লাগিল। তাহার পুরাণো সমাজও তখন নাই, নূতনেরও আশা নাই; ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হতাশা সম্বল করিয়া সে চলিল। সে হতাশার অন্ধকারে ধ্বংসের স্তূপে জীবনের বীজ কি হারাইয়া গেল?

সে বীজ অঙ্কুরের ফণা তুলিয়া উঠিল বিদ্বেষে। আসিল ওয়াহাবী আর ফকির-বিদ্রোহ। কিন্তু ইংরাজের রাজদণ্ডের আঘাতে বিপ্লবের সে অঙ্কুর বিনষ্ট হইল। একশত বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। একহস্ত পরিমিত যে মেঘ দেখা

দিয়াছিল, সেই মেঘ এবার আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বিপ্লবের ঝড়ে কাঁপিয়া উঠিল বণিকের সিংহাসন। ইংরাজ তাহার নাম দিল বিদ্রোহ। কিন্তু স্বাধীনতার ইহাই প্রথম সংগ্রাম। সে সংগ্রাম একদিন শেষ হইল, কিন্তু স্বাধীনতা আসিল না। তবু দেশের ইতিহাসের পাতায় রক্তে কয়েকটি নাম লেখা হইল। ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া টোপী আর মঙ্গল পাণ্ডে অমর হইয়া রহিলেন। আর রহিল অসংখ্য জনগণের রক্তের স্বাক্ষর।

ইংরাজ প্রমাদ গণিল। শুধু সমর-সজ্জা দিয়া দেশকে তো অধীন করিয়া রাখা সম্ভব নহে। তাই সে নূতন সেনাদল গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ইংরাজের কারখানায় তাহার ছাঁচে ঢালাই হইয়া তরুণদল বাহির হইয়া আসিল। চালে-চলনে, আচারে-ব্যবহারে তাহারা খাঁটি ইংরাজ। এই কালো ইংরাজেরা সরকারের বড় বড় পদ পাইল, ইংরাজ শাসনের স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ দেশ জয় করিয়াছিল, এবার দেশের মন জয় করিল।

ইংরাজ দেশের মন জয় করিতে বাহির-বিশ্বের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল, সেই পথে আসিল নানা ভাবধারা। দেশে সে ধারা আনিলেন রামমোহন। মরা গাঙে নূতন জোয়ার আসিল, চেতনাও নূতন হইয়া দেখা দিল। নূতন সাহিত্য দেখা দিল, রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হইল, ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভা। ইংরাজের কাছে আবেদন-নিবেদনের থালা বহিয়া আনিলেন দেশের মানুষ। ইংরাজ কিছু

সন্তুষ্ট হইয়া দিল, আসল জিনিষগুলি রাখিল নিজের হাতে। কিন্তু দেশের কালো ইংরাজেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মোহ ভঙ্গ সুরু হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, ভিক্ষায় হইবে না। নিজেদের শক্তি-পরীক্ষায় নামিতে হইবে। সেই শক্তির পরীক্ষা সুরু হইল ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গে।

দেশ সেদিন কাঁদিল না, ইংরাজ প্রভুকে দূষিয়া নিরস্ত হইল না, সে গর্জ্জিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে রব উঠিল, এ বিভাগ রদ করিতে হইবে। সরকারের সিদ্ধান্তকে টলাইতে হইবে। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী হইয়া আসিলেন। দেশের মানুষ দেশাত্মবোধের রাখী-বন্ধনে ধরা দিল। সংগ্রাম সুরু হইল; তাহার অস্ত্র বিদেশী-বর্জ্জন। দেশের একদল তরুণ কিন্তু এ অস্ত্র ব্যবহার করিতে রাজী হইলেন না। ইংরাজের উৎপীড়নের প্রত্যুত্তর তাঁহারা অস্ত্রমুখেই দিলেন। তাঁহাদের গুরু হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। ব্রিটিশ-সিংহও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে। সেও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। জেল ভরিয়া উঠিল; ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদানের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। তাহার পর আসিল প্রথম মহাযুদ্ধ।

দেখিতে দেখিতে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। এদেশের মানুষ যুদ্ধে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু দেশের মুক্তির আশা তেমনি সুদূরপরাহত হইয়াই রহিল। প্রতিদানে জুটিল অত্যাচার, অবিচার আর রাউলট আইন। সম্পূর্ণরূপে মোহ ভঙ্গ হইল। দেশের মানুষ এবার নিজেদের ছকে ইতিহাস

গড়িতে অগ্রণী হইলেন ; নেতারাও আর পিছনে থাকিতে পারিলেন না।

কংগ্রেসের মঞ্চে এবার আবির্ভূত হইলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন দেশের মানুষের দাবী ; তাহার পর নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন দাবী আদায়ের ভার। স্বরাজের দাবী অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেখা দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সে দাবী আরো শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

গান্ধীজী ডাক দিলেন। আসমুদ্র হিমাচল পৌঁছাইল সে-ডাক। ইংরাজের ভেদনীতি যাঁহাদের এতদিন পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, সেই মুসলমানেরাও এবার ছুটিয়া আসিলেন। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য এক হইল। সংগ্রাম নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। দেশের জ্ঞানী-গুণীরাও আর নিজেদের গৃহকোণে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন। পণ্ডিত মোতিলাল আসিলেন, সঙ্গে পুত্র জওহরলাল ; আসিলেন মওলানা মহম্মদ আলি আর শওকত আলি। ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া রিক্ত হইয়া আসিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র। দেশের অন্তঃপুরেও সে ডাক পৌঁছাইল। কত মহিলা গৃহকোণ ছাড়িয়া আসিলেন। কবিতার কুঞ্জ ছাড়িয়া কবি সরোজিনী নাইডু রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিলেন।

দেশের তরুণদল তখনও ইংরাজী শিক্ষার কারখানায়

ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই হইতেছিল। দেশের ডাকে তাহারও ছুটিয়া আসিল। চিত্তরঞ্জন তাহাদের লইয়া গড়িয়া তুলিলেন স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী। চাষী-মজুরের কাছেও ডাক পৌঁছাইল। কারখানায়, চা-বাগানে ধর্ম্মঘট সুরু হইল। চাষীরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিল। চিত্তরঞ্জন তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—তিনি বঞ্চিত সর্ব্বহারাদের বাদ দিয়া স্বরাজ চান না। আটানব্বই জন মানুষের স্বরাজই তাঁহার কাম্য।

সরকার প্রমাদ গণিল। জনগণের এই প্লাবনকে প্রতিরোধ করে এমন শক্তি কোথায়? তবু উৎপীড়ন চলিল, জেল ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত দেশবাসীকে জেলে পূরিবে—তেমন বিরাট জেল কোথায়?

গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া দেশের অধিকার বজায় রাখিবার কথা বলিলেন। পরিবর্ত্তনবাদী দল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু বিরোধীদল তাহা চাহিলেন না। শেষে চিত্তরঞ্জন জয়ী হইলেন। কংগ্রেস শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিল। ইংরাজের শাসনব্যবস্থা তিনি নানাভাবে অচল করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! তিনি তাঁহার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া একদিন চলিয়া গেলেন। তাঁহার কাজের ভার এবার তুলিয়া লইলেন তাঁহারই যোগ্য শিষ্য সুভাষচন্দ্র।

আইন করিয়া ইংরাজ দেশের মানুষের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে, সে অধিকার ফিরাইয়া আনিতে হইলে আইন

ভাঙ্গিতে হইবে। লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, ইহা তৈরী করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাই গান্ধীজী ঠিক করিলেন, এই লবণ আইন সবার আগে ভাঙ্গিবেন।

তিনি একদিন আইন ভাঙ্গিতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে আইন ভাঙ্গার আয়োজন। ইংরাজ সরকার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুভাষচন্দ্র আগেই গ্রেফ্‌তার হইলেন; জওহরলাল, গান্ধীজীও রেহাই পাইলেন না। কিন্তু সংগ্রাম থামিল না। পুলিস গুলী চালাইল, কারাগার ভরিয়া উঠিল, কিন্তু জনগণ দমিলেন না। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ইংরাজ চুক্তি করিল, আবার চুক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দেরী করিল না। তাহার পর একদিন বন্ধ হইয়া গেল সংগ্রাম, সরকার নেতাদের ছাড়িয়া দিল। ভারতের ক'টি প্রদেশে গড়িয়া উঠিল মন্ত্রিসভা। এবার গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অচ্ছ্যুৎদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

আর এক বিশ্বযুদ্ধের মেঘ পশ্চিমের আকাশে তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। একদিন যুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। কংগ্রেসে তখন ভাঙন ধরিয়াছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে চলিয়া আসিয়া নূতন দল গড়িয়াছেন। তিনি তখন বিপ্লবের প্রচেষ্টায় ব্রতী। এই চেষ্টায় একদিন তাঁহাকে ঘরছাড়া করিল। কেহ জানিল না, তিনি দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

মহাযুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিতেই কংগ্রেস আবার

গান্ধীজীকে ফিরাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়াই ঘোষণা করিলেন, এই যুদ্ধে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই ভারতবর্ষ যোগ দিতে পারে, নচেৎ নহে। সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিল, কিন্তু ফল হইল না, গান্ধীজী আবার সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। এই সংগ্রামের ধ্বনি হইল 'ভারত ছাড়'।

গান্ধীজী বন্দী হইলেন, নেতারা বন্দী হইলেন, কিন্তু 'ভারত ছাড়' ধ্বনি মরিল না। হয় দেশ স্বাধীন করিব, না হয় মরিব—এই শপথ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নেতা নাই, প্রস্তুতি নাই—তবু বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সরকার গুলী চালাইল, সংঘবদ্ধ জনতার উপর বিমান হইতে বোমা ফেলিল। কিন্তু যখন গণদেবতা জাগিয়া উঠিয়াছে—স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়াছে, তখন তাহাকে কি অত্যাচারে রোধ করা যায়?

সারা ভারত জুড়িয়া যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন সুভাষচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি তখন জার্ম্মানিতে ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। এদিকে জাপান যুদ্ধে নামিয়াছে; বর্ম্মা, মালয় তখন তাহার দখলে। সেখানে ভারতীয়দের কাছ হইতে তাঁহার ডাক আসিল—এশিয়ার মহান্ নেতা, এশিয়ায় আসিয়া মুক্তি সংগ্রামের ভার লউন। সুভাষ স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া গেলেন।

তাঁহার ডাকে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা ছুটিয়া আসিল, আসিলেন

মেয়েরা। ভারতের মুক্তির জন্য গড়িয়া উঠিল এক সেনাবাহিনী, গড়িয়া উঠিল আজাদ হিন্দ সরকার; সুভাষচন্দ্র হইলেন তাহার নেতা।

নেতাজী সুভাষ এবার সেনাবাহিনী লইয়া ভারত আক্রমণ করিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে উড়িল স্বাধীন ভারতের পতাকা। 'দিল্লী চলো' ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল, সেনাদল ছুটিয়া চলিল দিল্লীর পথে—স্বাধীনতার পথে।

কিন্তু হায়রে ভাগ্য! প্রবল বর্ষা নামিয়া আসিল পাহাড়ে জঙ্গলে। যানবাহন অচল। জাপান আত্মসমর্পণ করিল। নেতাজী সুভাষ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার আর সন্ধান মিলিল না। তবু দেশের মানুষ বিশ্বাস করে, তিনি বাঁচিয়া আছেন, আমাদের মধ্যে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

ইংরাজের সঙ্গে আবার আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া সৃষ্টি হইল দুই নূতন রাষ্ট্র—ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান। জনগণকে লইয়া, কংগ্রেস একদিন অকুল সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিল। অবশেষে তরী আসিয়া তীরে ভিড়িল।

দেশবন্ধু আগেই গত হইয়াছেন, নেতাজী নিখোঁজ, এবার মহাত্মাজীও চলিয়া গেলেন! তবে কি দেশের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিবে? না, তাঁহারা যে মৃত্যুহীন প্রাণ বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাণের সাড়া আজ দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে নিজের

আসন করিয়া লইয়াছে। চারিদিকে যখন যুদ্ধ-নাগিনীরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তখন সে শুনাইতেছে মহাত্মার শান্তির ললিত বাণী। সে শান্তি চায়। সে শান্তি ফিরাইয়া আনিবে এই অশান্তির পৃথিবীতে।

হল্‌দিঘাটা

রমেশচন্দ্র দত্ত



রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিলাত হইতে আই. সি. এস্. পাশ করিয়া বিভাগীয় কমিশনার পদে কার্য্য করেন। ইঁহার রচিত 'মাধবীকঙ্কন', 'বঙ্গ-বিজেতা', 'জীবন-প্রভাত', 'জীবন-সন্ধ্যা', 'সংসার ও সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। ইনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধবাঞ্ছা, অপর দিকে শিশোদিয়া-কুলের চির-স্বাধীনতা রক্ষার স্থির-প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল অপরিসীম

বীরত্ব। হল্‌দিঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধৃগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখাইতেছে।

পর্ব্বতের-শিখরের উপর অসভ্য ভীলজাতি ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বর্ষার বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রু-সৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সেই উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওয়ৎ ও গাওয়ৎ সকল কুলের যোদ্ধৃগণ ভীমনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। একদল হত হয়, অন্যদল অগ্রসর হয়, সহস্র সহস্র সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া সহস্র সহস্র সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন-দান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সেলিম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া

যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগল সৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বত-তরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্শা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন; সেলিম্ ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সেলিমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সেলিম্‌কে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন; হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সেলিম্ সেদিন জীবনরক্ষা পাইলেন। রোষে তর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখ-পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সেলিম্‌কে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও

তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ; মোগল সৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধৃগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে ; অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া তাহারা প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্ত স্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কার শব্দ করিয়া শিশোদীয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চিত-মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগল-রেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত। তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগল সৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল। প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে নিহত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ লইবে।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণ-পতাকা একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা-কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারাধিপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। দৈলওয়ারাধিপতি সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন,— "দৈলওয়ারা, অদ্য নিজের জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা

করিয়াছ।” দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন,—“ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে, বিপৎকালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।”

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষ দিন রজনীতে দৈলওয়ারাধিপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাধিপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হল্‌দিঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল; কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন যোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দিঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

অদৃশ্য আলোক

জগদীশচন্দ্র বসু



ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কলিকাতা বসু বিজ্ঞান-মন্দির ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় ইনি বাঙ্গলাদেশে অদ্বিতীয় ছিলেন। ভারত সরকার ইঁহাকে 'স্যার' এবং সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

সেতারের তার অঙ্গুলি তাড়নে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। দেখা যায়, তার কাঁপিতেছে ; সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে সুর উপলব্ধি হয়। এইরূপে তিনের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে,—প্রথমতঃ শব্দের উৎস কম্পিত তার, দ্বিতীয়তঃ বায়ু এবং তৃতীয়তঃ শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুস্পন্দন

প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ হাজার বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাট করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিংবা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না। কম্পন-সংখ্যা ষোল হইতে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়, অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ-স্পন্দনে সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক। আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুর মাত্র দেখিতে পাই। আকাশ-স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে, কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রং দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীল আলোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা আট শত লক্ষ কোটির ঊর্দ্ধে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোক উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি-

কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো, তাহার প্রমাণ কি ? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্ম্মাণ অধ্যাপক হার্টস্ সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে উর্ম্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন ; তবে তাহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলোক রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতু-ফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে, কিন্তু বৃহদাকার আকাশের ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ উর্ম্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর উর্ম্মি খর্ব্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহাতে আকাশোর্ম্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের একভাগ মাত্র হইয়াছিল। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তড়িতোর্ম্মি উৎপন্ন হয়। একদিকে একটি খোলা নল, তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়ত অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু-নির্ম্মিত একখানি পর্দ্দা আছে, তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনাপ্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা

ঐরূপ। তুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপে হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেই-রূপ কাঁটা নাড়িয়া আলোর উপলব্ধি জ্ঞাপন করে।

দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের হইয়া থাকে ; অনুভূতির দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই ধরিতে পারি। কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা অনেকেই ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধরা যাইতে পারে, সে বিষয় পরে বলিব। এখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রম-বিকাশ হইতেছে। বহু পূর্ব্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহা অন্ততঃ একদিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্য দিকেও কোন দিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য, তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহাই হউক, দৃশ্য আলোকের ন্যায় অদৃশ্য আলোকও নানা বর্ণের। অদৃশ্য আলোর রং সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোন বিশেষ রং নাই, সূর্য্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাত্‌রা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম ; অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে

তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গ্লাস সাম্‌নে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম! তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। ইট, পাটকেল যাহা যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাত্‌রা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম, সে দেশের জলাশয় হইতে মৎস্য ডাঙ্গায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের কার্য্য হয় ত সেইরূপই অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তাহাতে অভ্যস্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের শাদা কাগজের উপর দুইটি আলো-রেখা পতিত হইয়াছে; একটি লাল আর একটি সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে যায়। একবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম, লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না, কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, (১) সব আলো এক বর্ণের নহে; (২) কোন পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলেও একই পদার্থের ভিতর দিয়া এক আলো যাইতেছে এবং অন্য আলো যাইতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে, দুইটি আলো বিভিন্ন বর্ণের।

আলকাত্‌রা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ, ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের, তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষ্ণা মিটিত?

———

প্রাচ্য-ভারতের গৌরব

দীনেশচন্দ্র সেন



ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার কাজরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ইনি শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা করিতে করিতেই ইনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিতে আরম্ভ করেন। এই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যই' তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইনি ডি-লিট্ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেশ্বর—এমন কি, সিংহল, জাভা, বালি ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদে একই সংস্কৃত ভাষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, এজন্য সংস্কৃত ভাষা এরূপ অপূর্ব্ব বৈভব-শালিনী হইয়াছে।

আমরা প্রাচীনকালের কথা বলিতে যাইয়া সমস্ত পূর্ব্ব-ভারতকেই লক্ষ্য করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার বঙ্গ-বন্দনায় অশোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি অন্যায় করেন নাই। এক সময়ে মগধই সমস্ত পূর্ব্ব-ভারতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বঙ্গদেশের শিক্ষা-দীক্ষার মূল প্রস্রবণ—এই গঙ্গার আদি উৎস

হরিদ্বার স্বরূপ মগধ কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল ; মগধের উচ্চ শিক্ষা, মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়া গৌড়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই।

যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব্ব-সীমানায় কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে উত্তর সীমান্তে দার্জ্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতির নিকটে নেপাল উপত্যকার গোরক্ষপুরের অতি সান্নিধ্যে কপিলাবস্তু ও লুম্বিনীবনের সাক্ষাৎ পাই। তারপর সমেৎ-শেখরে (বর্ত্তমান মানভূম জেলায়) অবতরণ করুন, আরও দক্ষিণে নবদ্বীপ এবং তৎপূর্ব্বোত্তরে রঙ্গপুর, বিক্রমপুর ও প্রাগ-জ্যোতিষপুর চিহ্নিত করুন ; একটু পশ্চিমে ভাগলপুর এবং মগধ। এই যে ক্ষুদ্র একটা সীমানা দেওয়া হইল, সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রে তাহা অতি নগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সীমানা ইহা নহে। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমির সীমা টানিলে এই বিভাগ মানিয়া লইতে হইবে। এই বিভাগে আমরা বুদ্ধকে পাইয়াছি, তাহার অর্থ মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাট্ এই বিভাগের লোক। যিনি জগতের রাজন্যকুলের শিরোভূষণ—সেই অশোক এই বিভাগের নিবাসী। এই বিভাগে নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তপুর, জগদ্দল, সুবর্ণবিহার

প্রভৃতি জগতের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে পাইয়াছি। এই বিভাগে ধীমান্ ও বিতপাল চিত্রকলার সম্রাট্, তাঁহারা যে রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীন-জাপানে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই বিভাগে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর সমস্ত মাধ্যমিক মাহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বুদ্ধের নীচেই তাঁহার স্থান। বিক্রমপুরের শান্ত রক্ষিত ও শীলভদ্র একসময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষা-কেন্দ্রের গুরু ছিলেন। সুবিখ্যাত জৈনগুরু ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দীর্ঘকাল রাঢ়, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তদেশে তাঁহার চাতুর্যাম ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ৭৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মানভূমে সমাধি-লাভ করেন; এই মানভূম জেলায় আরও অনেক তীর্থঙ্করের সমাধিস্থান রহিয়াছে। রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং ত্রিপুর দেশে বঙ্গাধিপ রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকথা আসাম হইতে পাঞ্জাব এবং কলিঙ্গ হইতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এখনও গীত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে এখনও গোপীচাঁদের সন্ন্যাস রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং সেদিনও সুবিখ্যাত রাজ-চিত্রকর রবিবর্ম্মা বঙ্গের রাজা গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

মগধের সুবিখ্যাত সম্রাট্গণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। গুপ্ত,

পাল ও সেন সম্রাট্‌গণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অবকাশ এখানে নাই। কিন্তু উত্তরকালে সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে মূর্ত্তিমান্ হরি-নাম স্বরূপ যিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি এই দেশের ইতিহাসে একা। তিনি প্রেম-ভক্তি গগনের পূর্ণচন্দ্র। এদেশকে গঙ্গা যে উর্ব্বরতা ও শ্যামলী দান করিয়াছেন, মহাপ্রভুও বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে তদ্রূপ সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছেন। আমি সূক্ষ্ম ন্যায়শাস্ত্রের বঙ্গীয় গুরুদের নাম এখানে করিলাম না। তাঁহারাও প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল সদৃশ আসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের রূপ, সনাতন, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্যামানন্দ বৈষ্ণব-জগতের গুরুকুলের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসীন।

এখানে আমরা ভারত মানচিত্রের পূর্ব্বাংশের যে সীমা প্রদান করিলাম, তাহাতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জগতের আর কোথাও কি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এত বেশী মহাজনগণের আবির্ভাব হইয়াছে? বসোরা যেরূপ গোলাপের জন্মভূমি, এই সীমা-নির্দ্দিষ্টগণ্ডী তেমনই ধর্ম্মবীর ও সাধকগণের লীলাক্ষেত্র। এই পূর্ব্বভারত পবিত্র হইতেও পবিত্র। বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত—হিন্দুধর্ম্মের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখার প্রধান কেন্দ্রভূমি। উত্তরকালে ইস্‌লাম ও খৃষ্টধর্ম্ম এই দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই শক্তিশালী দেশকে গ্রাস করিবার উপযোগী প্রতিভা কোন বিদেশীর নাই। কিন্তু যে কেহ এই দেশে আসিয়াছেন, তিনি যাহা

কিছু ভাল আনিয়াছেন, এ দেশলক্ষ্মী তাহা রাজেশ্বরীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। বিদেশীরা ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বাঙ্গালীরা গ্রাস করিয়াছেন। যে মহাক্ষেত্রে এতগুলি শক্তির সংঘর্ষ হইয়াছে, সে দেশ,—সে সমাজ এঁধো পুকুরের মত আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা সে দেশের পক্ষে স্বাভাবিক এ দেশের লোক নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে। বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষে আসিয়া ইঁহারা সংস্কার-জয়ী হইয়াছেন। ইহাদের উদারতা ও শিক্ষার প্রসার যে কত বড়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যখনই বিদেশীয়গণ তাঁহাদের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির বলে রাষ্ট্র প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বন্যার মত এদেশে আসিয়াছেন, তখনই হয়ত কিছুকালের জন্য আত্মরক্ষার্থে আমাদের সমাজ তাঁহাদের প্রধান সম্পদ্‌কে অতিরিক্ত মাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। কচ্ছপ যেরূপ মাংস-লুব্ধ হিংস্রজন্তু হইতে নিজের কোমল দেহ রক্ষা করিবার জন্য বাহিরে একটা কঠিন আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুসমাজ সেইভাবে সময়ে সময়ে একটা অতিরিক্ত গোঁড়ামির গণ্ডী স্থাপন করিয়া পররাজ্যাধিকারলোলুপ জাতিগুলি হইতে নিজেকে পৃথক্ করিরা রাখিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সেইরূপ একটা আত্মরক্ষার আবরণে বেষ্টিত, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে এখনও যে চিন্তার প্রসারতা ও মানসিক স্বাধীনতা আছে, অন্য দেশের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ড নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ; এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের গৌরব, নাম ও সীমার কিছুই ঠিক ছিল না। বহুধা-বিভক্ত এই দেশের যে রাজা যখন প্রবল হইয়া উঠিতেন, তাঁহার রাজ্যের গণ্ডী কিছুকালের জন্য তখন বাড়িয়া যাইত।

এককালে গৌড়দেশের নামে কান্যকুঞ্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বিন্ধ্যোত্তর প্রদেশ পরিচিত হইত, গৌড়ের নামে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত নামাঙ্কিত ছিল। গৌড়ের শ্রেষ্ঠ রাজা 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করিয়া সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন। এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি কালে গৌড়ের রাজন্যবর্গের কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল। রাজা গণেশকে কৃত্তিবাস 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং দ্বিজমাধব ও বিজয়গুপ্ত গৌড়াধিপ হুসেন শাহেরও ঐ নামেই পরিচয় দিয়াছেন। এখনও পুরীর রাজার এক উপাধি 'পঞ্চগৌড়েশ্বর।' সিংহপুরের রাজারা উড়িষ্যা বিজয় করিয়া 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কুচবিহারের প্রাচীন ইতিহাসে তথাকার রাজাদিগেরও এই উপাধি দৃষ্ট হয়।

"গান্ধার হ'তে জলধি শেষ" পর্য্যন্ত রাজ্য—আমাদের এই গৌড়দেশ—বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগ—মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত ছিল।

এই বৃহৎ ভূভাগ পরস্পরের অতি-সান্নিধ্য হেতু এবং যুগে যুগে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসনাধীন থাকার দরুণ শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় ঐক্যলাভ করিয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যে অনেক স্থলে বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের সময় হইতেই আমরা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের বিশেষরূপ উল্লেখ পাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে আমরা এই ভূ-ভাগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কীর্ত্তি অবগত হই। মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র, বাসুদেব, অঙ্গরাজ কর্ণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরক ও ভগদত্ত এবং বঙ্গাধিপ চিত্রসেন, সমুদ্রসেন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহাদের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী



মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার নৈহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত সরকার ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় এবং সি. আই. ই. উপাধি দান করেন। 'মেঘদূত', 'বাল্মীকির জয়', 'প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরব' প্রভৃতি ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

বৌদ্ধজগতে দীপঙ্করের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতন দীপঙ্করের শিষ্য ছিলেন, এখনও তিব্বতের প্রধান লামা ও চীনের সেকালের সম্রাটেরা এবং এ-যুগের ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

দীপঙ্কর পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর—বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের পিতামাতা তাঁহাকে চন্দ্রগর্ভ বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবে তিনি জিতারি নামক

একজন অবধূতের নিকট বাল্যশিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি দর্শন ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়াছিলেন। দীপঙ্করের যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাঁহার যশঃও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য আসিয়া শেষটায় নিজেরাই পরাজিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ওদন্তপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীল রক্ষিতের নিকটে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন। একত্রিশ বৎসরের সময় তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশিলা বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানে চন্দ্রকীর্ত্তি নামে একজন আচার্য্য ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিক্রমশিলার মঠের অধ্যক্ষ দীপঙ্করকে সুবর্ণদ্বীপে পাঠাইলেন।

দীপঙ্কর বার বৎসর কাল সুবর্ণদ্বীপে থাকিয়া সেখানকার বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন এবং সেখানকার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশিলার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল।

এই সময়ে তিব্বতদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে। এইজন্য তিব্বতদেশের রাজা (লামা) বিক্রমশিলা বিহার হইতে দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন।

দীপঙ্কর কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদিন তিব্বতের রাজা (লামা) তাঁহাকে 'অতীশ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতের তদানীন্তন লামার একান্ত আগ্রহ ছিল। এইজন্য তিনি ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধবিহারে কয়েকজন তরুণ শ্রমণকে (ভিক্ষুকে) পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশিলায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই দেশে গিয়া দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা প্রচার করায় লামা তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। দীপঙ্কর দুই-একবার তিব্বতে যাইতে অস্বীকার করিয়া অবশেষে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সেখানে যাইতে স্বীকার করিলেন।

তখন দীপঙ্করের বয়স সত্তর বৎসর। এই বয়সে বরফে-ঢাকা দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণ করা যে কি ক্লেশজনক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দীপঙ্কর যখন তিব্বতের গুজে নামক স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন রাজার প্রেরিত একশত শ্বেত-পরিচ্ছদ-পরিহিত অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ছিল ছোট ছোট নিশান, শাদা রঙের কুড়িটি ছাতা, আর নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র। এই অশ্বারোহীরা অতি মধুর স্বরে বাদ্যযন্ত্রের সহিত "ওঁ মণিপদ্মে হুঁম্" এই গান গাহিয়া লামার নামে তাঁহাকে অভ্যর্থনা

করিয়াছিল। তিব্বতের এক মঠের গায়ে অতীশের এই অভ্যর্থনার চিত্র অঙ্কিত আছে।

রাজা চানচুব্ নিজে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দীপঙ্করকে দেখিয়া লামা ও রাজ-ধানীর সমুদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জংপো নামক একজন বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করেন নাই; কিন্তু যখন দীপঙ্করের জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন, তখন তিনিও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। এইখানে তিনি দুই বৎসর ছিলেন, পরে তিব্বতে গিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ দীপঙ্করের শিক্ষাগুণে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে নূতন জীবনের ধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেখানে যাইয়া তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজিও সহস্র সহস্র লোক দীপঙ্করকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

বাণী-মুক্তাবলী

ঈশ্বরের সেবা

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সদয় ব্যবহার

জীবের প্রতি যে সদয়, ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন। হে মানব! ভালই হোক, আর মন্দই হোক, জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে কার্পণ্য করিও না। অসতের প্রতি সদ্ব্যবহারই মানুষকে মঙ্গলের পথে চালাইবার একমাত্র উপায়। ইহা অপেক্ষা মহত্তর শিক্ষা নাই

—হজরত মোহাম্মদ

ধর্ম্ম

যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম ; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও উর্দ্ধে যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে উর্দ্ধে—দেবলোকে ; ইহার শাখা-প্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানবসমাজে কর্ম্মরূপ ফুল-ফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পদ্যাংশ

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়গণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্যে 'নোবেল্ পুরস্কার' লাভ করেন। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের সকল বিভাগে ইঁহার অসীম প্রভাব বিদ্যমান। ইনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর,
সুন্দর কর হে।

জাগ্রত কর, উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস
নিঃসংশয় কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত
নিঃস্পন্দিত কর হে।
নন্দিত কর নন্দিত কর
নন্দিত কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে।

———

পূজারিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন, ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক-প্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে
পিতার আসনে আসি'
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে

সঁপিল যজ্ঞ-অনল আলোতে
বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ্ হবে।"

সেদিন শারদ দিবা-অবসানে,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী,
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি'।

শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা—
"এ কথা নাহি কি মনে?
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্ব্বাসনে।"

সেথা হ'তে ফিরি গেল চ'লি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।

সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সিঁথির সীমার' পরে।

শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি' গেল রেখা
কাঁপি' গেল তা'র হাত,—
কহিল "অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চলে',
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ'লে
বিষম বিপৎপাত !"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি' কিঙ্কিণী
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।
শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।

কহে সাবধানে তার কাণে কাণে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে ?"

দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি,
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলাল
নগর-সৌধ'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে !
সিংহ-দুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,

"মন্ত্রণা-সভা হ'ল সমাধান"
—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময় হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত।

মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল,—"কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি!"
মধুর কণ্ঠে শুনিল—শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী!"

সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা!

———

মেঘনাদ ও বিভীষণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রবর্ত্তক হিসাবে ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,—
"জানিনু, কেমনে আসি' লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী,—
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ!—শূলী শম্ভুনিভ—
কুম্ভকর্ণ!—ভ্রাতুষ্পুত্র বাসব বিজয়ী!
নিজ গৃহ-পথ, তাত, দেখাও তস্করে,—
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা; গুরুজন তুমি—
পিতৃতুল্য! ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে—
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,—
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা
ধীমান্! রাঘব-দাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি,—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,—
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?—
কে বা সে অধম রাম। স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে ;—
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে
শৈবালদলের ধাম ?—মৃগেন্দ্র-কেশরী
কবে, হে বীর-কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
দেব-দৈত্য-নর-রণে স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের। কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল

দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব রাজপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হা বিধাতঃ ! নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ! প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ! কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি—ভ্রাতুষ্পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ, কেমনে ?"
মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ অনুজ লক্ষ্যি, রাবণ-আত্মজে,—
"নহি দোষী আমি, বৎস, বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি। নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পর-দোষে কে চাহে মজিতে ?"
রুষিলা বাসব-ত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমুতেন্দ্র কোপি'—
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে

তুমি,—কোন্ ধর্ম্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ?   শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন ; গুণহীন স্বজন—তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা !”

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় ; অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্যে বরি
খেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
“ওরে, বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।”
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

বর্ষ-সঙ্গীত

কামিনী রায়



কামিনী রায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাসণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্বামীর নাম কেদারনাথ রায়। ইনি বাঙ্গলার প্রথম প্রতিভা-শালিনী মহিলা-কবি। ইঁহার রচিত 'আলো ও ছায়া', 'অম্বা,' 'পৌরাণিকী', 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরীক' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক বাঙ্গলার পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। ইনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

আপনার বেগে, আপনার মনে
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার,
দেখিতে বারেক ফিরি' না চায়।
কার নয়নের ফুরাল না জল,
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত,
কাহার হৃদয় নিশীথে দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত,
কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হ'য়ে,

কার হৃদিশোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে,
দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অস্তের পথে,
অই যায় চলে, অই যায়—যায়
সৌর-দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে।
বরষের পর বরষ যাইছে
বিদায়ের কালে চরণে তার,
কত প্রাণ ভাঙ্গি, কত আঁখি দিয়া
পড়িছে তরল মুকুতা ভার;
আপনার ভাবে, আপনার মনে,
অশ্রুসিক্ত পদে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব,
কারো মুখ পানে ফিরি' না চায়।
ম্রিয়মাণ প্রাণ আশা ভর করি'
বরষ-প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয় কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।
জীবন-বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরীমালা,
ভুলে যাই গত বিষাদ বেদন,
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।

একটি প্রভাত সুখে কেটে যায়
আশার মৃদুল সুরভি-বায়,
একদিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া
একদিন পাখী মধুরে গায়।
আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া
তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয়-গগন আবার আবার গ্রাসে।
পড়িয়া উঠিয়া, থামিয়া চলিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টকরাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম,
কখন বা কাঁদি কখন হাসি।
আপনার বেগে, আপনার মনে
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি' চলিল,
দেখিবার তরে ফিরে না চায়।

———

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল্. রায়) ১২৭০ সালে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বহু নাটক, প্রহসন ও কবিতা রচনা করিয়া ইনি বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'আর্য্যগরিমা,' 'অবতার', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৩২০ সালে কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

ভারত আমার, ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থ।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।

ভগবদ্‌গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে,
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর,
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে,
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র,
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম
যাঁদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম্ম,
আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র !
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাঁদের গরিমাময় এ অতীত,
তাঁরা কখনই নহে মা তুচ্ছ !
ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হউক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব !
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানববংশ,

যাঁদের মহিমাময় এ অতীত,
তাঁদের কখনও হবে না ধ্বংস।
চোখের সাম্‌নে ধরিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে,
আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে তুমি মা, কৃপার পাত্রী !
কর্ম্মজ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্মধ্যানের তুমি মা ধাত্রী !

নবীন বঙ্গ

কালিদাস রায়



কবিশেখর কালিদাস রায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইনি 'কিশলয়', 'পর্ণপুট,' 'ব্রজবেণু,' 'ঋতুমঙ্গল,' 'হৈমন্তী,' 'চিত্ত-চিতা, 'বৈকালী' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রচিল ধর্ম্ম-ত্রিবেণী তীর্থ তব ভগবান্ পরমহংস
শ্রুতির বার্ত্তা শুনাইল পুনঃ তব রায়, সেন ঠাকুর বংশ।
বাড়বোজ্জ্বল করুণা-সাগর ভরিল অঙ্ক রত্নপুঞ্জে,
বঙ্কিম নব শুভ সংসার রচিল তোমার মাধবী কুঞ্জে।
দত্ত, মিত্র, গুপ্ত, বসুর অর্ঘ্যে পদারবিন্দে দীপ্তি,
গিরিশ, নবীন, হেম, মধু করে সুধাদানে জ্ঞান-ক্ষুধার তৃপ্তি,
মতি, সুরেন্দ্র মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করে অযুত শিষ্যে,
ব্রতী ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যা-বর্ত্তিকালোক বিতরে বিশ্বে!
জ্ঞানী দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
স্বর্ণ, তারক, মহ্‌সীন, মণি বলির ধর্ম্মে হ'য়েছে নিঃস্ব।
রাজনীতি-রণক্ষেত্রে ধ্বনিল রথী শ্রীকৃষ্ণদাসের শঙ্খ,
শোভে আশুতোষ, মৈত্র, ত্রিবেদী অলিসম তব কমল-অঙ্ক

ঋষি মহেন্দ্র, গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার জলে বাঁধিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়ন-হোমানলে করে হবির বৃষ্টি।
বহে গুরুদাস অগুরু পাত্র, অবনীর করে প্রাচীন ছত্র,
যোগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে লিখিল তোমার বিজয় পত্র।
তব অপত্য দূর ভূখণ্ডে লভিল শৌর্য্য-সৈনাপত্যে,
তোমার চিত্ত, জিনিয়া বিত্তে চিনিল নিত্যে—চরম সত্যে।
দুহিতারা তব জাগ্রত করে রমণী-গরিমা তিমির-লুপ্ত,
সেন, সরকার, শাস্ত্রী তোমার করে প্রবুদ্ধ কীর্ত্তি সুপ্ত।
সত্ত্ব-রজের মিলন-মন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুকূলে সাম্যসামের ছন্দ।
শরৎচন্দ্র-মরীচি-মালায় কল্পসুষমা তোমার অঙ্গে,
তব বন্দনা কূজে আনন্দে কাব্যকুঞ্জে কোটি বিহঙ্গে।
ধেয়ান-স্তব্ধ যোগ-নিরুদ্ধ মুদিত তোমার হৃদরবিন্দ,
কোটি ভক্তের দুর্জ্জয় তপে তোমার আননে দ্যুতি অনিন্দ্য।
পুত্র তোমার আর্ত্তের তরে বরিছে শীর্ষে অশনিবর্ষ ;
দেশের কর্ম্মে, সেবার ধর্ম্মে যাদের আত্মত্যাগের হর্ষ ;
লুটি মাগো, তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ।
জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

———

যমুনাতটে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'বৃত্রসংহার,' 'চিন্তাতরঙ্গিনী', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদিরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল !
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিনী-জল।
কুসুম, পল্লব, লতা, নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা' পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝি ডাকে, জগৎ ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি', যমুনার তটে বসি',
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি' যায়।
কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখনাপরণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান,
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ-অন্বেষণে,

তখন বিজন বন, শান্ত বভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে,
প্রশান্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে ?
কি সুখ যে হেন কালে, গৃহ ছাড়ি' বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পূরেছে হুতাশে।
ভাসায়ে' অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হু হু ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার—
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি' গভীর নিশীথে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় গামী বিজন ভূমিতে!
হায়রে, প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে—বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী।

জাতির পাঁতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার চুপী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছন্দের উপর ইঁহার অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। 'বেণু বীণা,' 'হোম-শিখা', 'তীর্থ-সলিল'. 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর' প্রভৃতি ইঁহার রচিত সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ইনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু
সে জাতির নাম 'মানুষ' জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত,
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো ক'রে তুলি,
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধিগো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল,
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ,
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ. ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়.
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি' কত নির্মোক,
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি ;
জড়তার জাড়ে রয়েছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি'।
পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলস ছাড়িছে
হাজার হাজার বছর ধ'রে।
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোন কল্লোল বন্যাজলে,
জমা হয়েছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে লাগিবে দু'দিন পরে,

মহামানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকার তার মাল্য যোগায়
গন্ধবেণেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তা'রে তোষে নৃত্য-গানে।
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা যোগায় ছানা সর ননী
তাঁতীরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী।
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
কেহ হেয় নাই সবাই সমান,
আদি জননীর পুত্র সবে ;
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল—
জাতির তর্ক কেন গো তবে ?
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহ রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

———

কাণ্ডারী হুশিয়ার

নজরুল ইস্‌লাম



কাজী নজরুল ইস্‌লাম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া ইনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত হন। ইনি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'সঞ্চিতা', 'সর্ব্বহারা', 'নজরুল গীতিকা' প্রভৃতি ইঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। বর্ত্তমানে ইনি কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বাণীসেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন।

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে, সাথে দিতে হবে অধিকার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন্?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ?
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ! ত্যজিবে কি পথ মাঝ
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার?
কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর?
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার!

———

দীপালি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক



শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশেষভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি। ইঁহার রচিত 'শতদল', 'বন-তুলসী', 'উজানি', 'বন-মল্লিকা', 'নুপূর', 'রজনীগন্ধা,' প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থগুলি বাঙ্গলার কাব্য সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মঙ্গলকোটে বিজয় শেঠের সমান ছিল না ধনী,
কাজি খোন্দকার মোল্লা সাহেব সবে তাঁর কাছে ঋণী !
কত জমিদারী, আয়মা মহল, সুদের দেনায় তাঁর,
ভিখারী করিয়া বড় বড় বাড়ী হয়ে গেছে ছারখার।
গ্রামের ভিতর আলি নওয়াজ দয়াশীল জমিদার,
কতই হিন্দু কত মোস্‌লেম, কৃপায় পালিত তাঁর।
তাঁহার নিমক খায় নি যাহারা অল্পই ছিল সেথা,
বিজয়ের কাছে তিনিও যে ঋণী, অন্যের কিবা কথা !
গ্রামে কাণাকাণি শীঘ্রই শেঠ নিলামে লইবে কিনে,
তাঁর জমিদারী, আয়মা যে সব বন্ধক আছে ঋণে।
শুনিয়া এ কথা বিষম ব্যথিত গ্রামের গরীব দুঃখী,
কেবল ক'জন আত্মীয় তাঁর হয়েছিল কিছু সুখী।

আলি নওয়াজ নীরবে সহেন মরমের ব্যথা মনে,
অস্ফুট তাঁর গভীর বেদনা জানে শুধু একজনে।
চাহিয়া পাঠালে কত আত্মীয় শুধে লয় ঋণভার,
আলি নওয়াজ করিবে কি নত উন্নত শির তাঁর ?
সে যে মোখাদিম নহে ত বেতস দুঃখবেগে হবে নত,
দাঁড়ায়ে পুড়িবে বজ্র-আগুনে ভীম তালতরু মত।
আলি নওয়াজ করিলেন স্থির আল্লা করেন যাহা,
ঋণ শোধ দিয়ে মদিনা যাবেন কাটায়ে দেশের মায়া।
হ'ল যদি হায় ফল-ছায়াহীন বিশাল বিটপী হেন;
পথিকের দয়া, লইতে এখানে দাঁড়ায়ে রহিব কেন ?

* * * *

পুড়িছে পট্‌কা উড়িছে হাউই খেলিছে আকাশ-বাজি,
ঘরে ঘরে শত জ্বলিতেছে দীপ হিঁদুর দেয়ালি আজি।
অশ্বে আরোহি' নওয়াজ সাহেব দেখিতে গেলেন ঘটা,
আঁধার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল খর আলোকের ছটা।
ফিরালেন ঘোড়া দেখিলেন দূরে বিজয় দাঁড়ায়ে আছে,
চমকি' উঠিল হৃদয় তাঁহার কোন কথা বলে পাছে।
আভূমি আনত সেলাম করিল আসি, শেঠ তাড়াতাড়ি
বলিলেন আলি,—"সেলাম শেঠজী, এই আপনার বাড়ী ?"
বিজয় বলিল,—"হুজুর, আজিকে এসেছেন এই পথে,
ছাড়িয়া দিব না আমার গৃহেতে পদধূলি হবে দিতে।"

বুঝিলেন আলি, ঋণের কথাই গোপনে বলিতে একা,
চতুর বিজয় গৃহে লয়ে যাবে করিতে এসেছে দেখা।
যা হ'ক নামিয়া বিজয়ের সাথে গেলেন ভবনে তাঁর,
কি জানি কি বলে এই ভাবি হৃদি কাঁপিল যে কতবার।
সজ্জিত গৃহে চারু কেদারায় বসায়ে তাঁহারে হেসে,
বিনয়ের সাথে বিজয় বসিল জানু পাতি' ভূমে এসে।
মুগ্ধ নওয়াজ হেরিয়া বিনয় দেখেন আলোক রাজি,
মাগেন বিদায় শেষ হ'ল যবে পোড়ান আতসবাজি।
বিজয় বলিল,—"দেখিলেন যাহা, এ সব তবু ত ফাঁকি,
মোর হাতে গড়া রঙ্ বাতি আলো দেখাতে রয়েছে বাকি—"
এত বলি ধীরে বাক্স হইতে গুটান কাগজখানি,
প্রদীপে ধরিয়া পোড়াতে পোড়াতে সমুখে ধরিল আনি।
"কি কর, কি কর! বাতি নয় ও যে আমারি সে তমসুক!"
"জানি আমি তাহা" বলিল বিজয় পুলক-মাখান মুখ।
"আপনার স্নেহে জনক পালিত শুনিয়াছি বহু দিন,
শুভ আগমনে করিলাম তাই এই রোশনাই ক্ষীণ।
আজিকে আমার সুখের দেয়ালি" বিজয় বলিল হাসি',
আলি নওয়াজের বিশাল নয়ন শুধু জলে গেল ভাসি'!

———

কিশোর

গোলাম মোস্তফা



জনাব গোলাম মোস্তফা যশোহর জেলার শোলকুপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমান যুগের অন্যতম সুকবি। সুকুমার ভাব ও বিচিত্র ছন্দোমাধুর্য্য ইঁহার কবিতার বিশেষত্ব।

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙ্গা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপ্‌ড়ি-পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটব মোরাও ফুটব গো,
অরুণ-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে
আকাশ পানে তুলব মাথা—সকল বাঁধন টুটব গো।

সাগর জলে পাল তুলে দে' কেউ বা হ'ব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতই বা কেউ পৌঁছে যা'ব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময়—
এই বাঙ্গালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।
কেউ বা হ'ব সেনানায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি', নাই বা থাকুক্ অন্য বল।
দেশমাতারে পূজ্‌ব গো,
ব্যথীর ব্যথা বুঝ্‌ব গো,
ধন্য হ'বে দেশের মাটি, ধন্য হ'বে অন্নজল।
জ্ঞান-গরিমা শিখব ব'লে কেউ বা যা'ব জার্ম্মানি,
সবার আগেই চল্‌ব মোরা, আর কি কভু হার মানি!
শিল্পকলা শিখ্‌ব কেউ,
গ্রন্থমালা লিখ্‌ব কেউ,
কেউ বা হ'ব ব্যবসাজীবী, কেউ বা 'টাটা', 'কার্ণানি'।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে!
আকাশ-আলোর আমরা সুত,
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কি যে করব মোরা—নাইক তাহার অন্ত রে!

সাগর ও আকাশ

হুমায়ূন কবীর



জনাব হুমায়ূন কবীর পূর্ব্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গলার উদীয়মান সুকবিদের অন্যতম। ইঁহার বহু কবিতা বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ইনি ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন।

এত কাছে, তবু এত দূর !
সুদূর দিগন্ত-শেষে আকাশ সমুদ্রে মেশে,
হেথায় সাগর-বেলা তরঙ্গ-বন্ধুর,
বিরাম বিশ্রান্তি নাই নিমেষের ক্লান্তি নাই,
দিবানিশি আলোড়িয়া উদ্দাম আবেগে—
বর্ষ নাই, মাস নাই, কোন অবকাশ নাই,
আদিম অনন্ত সিন্ধু রহিয়াছে জেগে।
হেথায় সাগর-বেলা তরঙ্গ-মুখর।
আকুল তরঙ্গরাশি উচ্ছ্বসি' পড়িছে আসি',
বাজিছে দিবস-নিশি অনন্ত মর্ম্মর।
সারাদিন আলোড়িয়া, বেদনায় গুমরিয়া
এমন ব্যাকুল প্রাণে কাহারে সে চায় ?

কাহার বিরহে ধরা এমন বেদনা-ভরা ?
দিবানিশি অবিরাম লুটিছে বেলায় !
আকাশ চাহিয়া আছে, মেলি' স্মিত আঁখি।
সোনার তপন হাসে, আলোকে ভুবন ভাসে,
ঊর্ম্মি-শিরে মণি জ্বলে রবিকর মাখি'।
চপল শিশুর মত, দিবানিশি অবিরত
সহস্র তরঙ্গরাশি গগনের পানে
প্রসারিয়া বাহু দু'টি কোথা যেতে চাহে ছুটি' ?
আকাশ ছুঁইতে চাহে কিসের সন্ধানে ?
ভাষা নাই, দিশাহারা, উদাসী পাগলপারা,
দিবস-রজনী সিন্ধু গাহে এ কী গান ?
হেথায় বসিয়া একা, অন্ধকারে ঊর্ম্মিরেখা
নাহি দেখি, শুধু শুনি উন্মাদ আহ্বান !
অর্থ নাহি বুঝি কিছু, নাহি জানি আগু-পিছু,
কেবল অবাক্ আঁখি সুদূরে প্রসারি,
স্তব্ধ হিয়া অবিরল শুনি তার কলকল,
নেহারি অনন্ত বারি উঠিছে বিথারি'।

পুণ্যবতী খোদেজা

সৈয়দ এম্‌দাদ আলি



সৈয়দ এম্‌দাদ আলি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক। ইঁহার রচনা রসাল, আড়ম্বরশূন্য ও কবিত্বময়।

ঘন ঘোর অন্ধকারে আরব-গগন
যবে সমাচ্ছন্ন, দেবি, আরব-সন্তান
কু-আচার, ব্যভিচারে ঘোর নিমগন,
সে সময় যে বীরেন্দ্র, মানব-প্রধান
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ করি' বিতরণ
নাশিল তিমির-রাশি, সকলের আগে
চিনিলে তাঁহারে তুমি, করিয়া যতন,
শত ভালবাসা দিয়া শত অনুরাগে
বরিলে সে বরবপু, একাগ্র অন্তরে
স্থাপিলে বিশ্বাস দেবি, ইস্‌লাম উপরে।
কত যুগ মিলাইল কালের প্রবাহে,
তবু দেবি, তব কথা মোস্‌লেমের গেহে

ভক্তিভরে নবোৎসাহে হয় উচ্চারিত
প্রতিদিন, শত শত ভক্ত রসনায়—
তোমার কাহিনী গায়, করি' বিমোহিত
প্রতি মোস্‌লেমের প্রাণ। প্রত্যেক হিয়ায়
যাচে বর, কন্যা-জায়া হউক তাহার
তব মত পতিপ্রাণা, সতীত্ব-আধার,
তব মত ধর্ম্মে তারা হ'ক স্থির অতি,
তব মত প্রতি কর্ম্মে ধর্ম্মে থা'ক মতি।
তোমারি মতন তারা পতি-বুকে থাকি',
প্রকৃত কর্ম্মের পথে নিক্ তাঁরে ডাকি'।

মোছ আঁখি

চিত্তরঞ্জন দাশ



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার তেলিরবাগে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার রচিত 'সাগর-সঙ্গীত' বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

মোছ আঁখি ; মনে কর, এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ।

রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক্ প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখজ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি-আবরণ টানি' দুঃখ ভুলে যাও ;
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি' বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় ! হায় ! জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম-কলি নয়ন-কিরণে—
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক-ভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন-সাধনা।
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

কলিকাতা